আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ
(Legal Aspects of Financial Markets)

ইউনিট ২

ভূমিকা

ইউনিট ১ এ অর্থায়নের বিবর্তনের পাঠে দেখেছেন যে, ধীরে ধীরে পুঁজি গঠনের জন্য আর্থিক বাজার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। অর্থায়নের সাথে আর্থিক বাজারের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যে বাজারে সল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি আর্থিক সম্পদসমূহ লেনদেন হয় তাকে অর্থবাজার বলে। আর্থিক বাজারকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- অর্থ বাজার ও মূলধন বাজার। অর্থ বাজার বলতে যেখানে স্বল্প মেয়াদি (১ বছর বা তার কম সময়) আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় তাকে বুঝায়। অন্যদিকে যে বাজারে দীর্ঘ মেয়াদি (১ বছরের বেশি সময়) আর্থিক সম্পদ সমূহ লেনদেন করো হয় তাকে পূজি বা মূলধন বাজার বলে। আর্থিক বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন- শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সিকিউরিটিজ একচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩, ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ ইত্যাদি। আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার যে সকল আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে এবং নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ যে সকল বিধি অনুযায়ী তা পরিচালনা করে আসছে তার আলোকেই আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ গড়ে উঠেছে। এবার আসুন আমরা আর্থিক বাজারের সাইনগত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জেনে নেই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ ঃ আর্থিক বাজার ও আর্থিক বাজারের প্রকারভেদ, অর্থ বাজার ও পুঁজি বাজারের উপাদান সমূহ।

পাঠ-২.২ ঃ শেয়ার বাজারের ধারণা, প্রকারভেদ, স্টক এক্সচেঞ্জ ও এর প্রকারভেদ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজারের মধ্যে পার্থভক্য।

পাঠ-২.৩ ঃ আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ ও আইন সমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা।

মূখ্য শব্দ	আর্থিক বাজার, অর্থ বাজার, পুঁজি বাজার, শেয়ার, বন্ড, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সাধারণ বিমা, জীবন বীমা ও আইনসমূহ।

পাঠ-২.১ আর্থিক বাজার ও আর্থিক বাজারের প্রকারভেদ, অর্থ বাজার ও পুঁজি বাজারের উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্থিক বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আর্থিক বাজারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থ বাজারের ধারণা ও উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুঁজি বাজার ধারণা ও উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

আর্থিক বাজারের ধারণা

আর্থিক বাজার এমন একটি বাজার যেখানে আর্থিক সম্পদসমূহ ক্রয়-বিক্রয় হয়। আর্থিক সম্পদসমূহ হলো: শেয়ার, বন্ড ও বাণিজ্যিক পত্র ইত্যাদি। আর্থিক বাজারে দু'ধরনের একক থাকে যেমন: উদ্বৃত্ত একক/সঞ্চয়কারী ও ঘাটতি একক। উদ্বৃত্ত একক বলতে তাদেরকে বুঝায় যাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় কম অর্থাৎ যারা আর্থিক বাজারে অর্থ সরবরাহকারী অন্যদিকে ঘাটতি একক হলো তারা যাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি অর্থাৎ যাদের অর্থের চাহিদা রয়েছে। যেমন: ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকার ইত্যাদি। আর্থিক বাজারে একটি পক্ষ তহবিল সরবরাহ করে এবং অন্য একটি পক্ষের তহবিলের প্রয়োজন হয়। তহবিলের চাহিদাকারীগণকে ঘাটতি একক বলে এবং তহবিলের যোগানদাতাগণকে উদ্বৃত্ত একক বা সঞ্চয়কারী বলে।

আর্থিক বাজারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:
১. অর্থ বাজার (Money Market)
২. পুঁজি বাজার (Capital Market)

১. অর্থ বাজার (Money Markets)

অর্থ হলো এমন একটি বাজার যেখানে স্বল্পমেয়াদী (১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়) আর্থিক সম্পদসমূহ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। সুতরাং যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের কম মেয়াদ সম্পন্ন আর্থিক সম্পদসমূহ লেনদেন হয় তাকে অর্থ বাজার বলে। উদাহরণস্বরুপ সরকারের স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন মেটাতে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিলের ক্রেতা হলো বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এভাবে অর্থ বাজার স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন মেটাতে পারে। অর্থ বাজারের উপাদানসমূহ হলো: ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজ, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, পুণঃক্রয় চুক্তি, হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

অর্থ বাজার নির্দিষ্ট কোন স্থানে কেন্দ্রীভুত থাকে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অর্থ বাজার পরিচালিত হয় যেমন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সাধারনত কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ বাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। কারণ এটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি শ্রেণিকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ করে থাকে। যেমন: ব্যাংক বাণিজ্যিক কাগজ বাট্টাকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আর্থিক বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হল কেন্দ্রিয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থ বাজার সিকিউরিটিজ/উপাদানসমূহ:

অর্থ বাজারের উপাদানসমূহ হলো: ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজ, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, পুণঃক্রয় চুক্তি, হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট ইত্যাদি। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. ট্রেজারি বিল: ট্রেজারি বিল সরকারের ট্রেজারি বিভাগ ইস্যু করে থাকে। ভবিষ্যতের কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে বিলের অর্থ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে সরকার যে স্বল্পমেয়াদি অঙ্গীকারপত্র ইস্যু করে তাকে ট্রেজারি বিল বলা হয়।

- সাধারনত ট্রেজারি বিল নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে (বাট্টায়) বিক্রয় করা হয়। কারণ এটির উপরে কোন কুপন সুদ প্রদান করা হয় না।
- এটির নির্ধারিত মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য হলো ট্রেজারি বিল ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সুদ।
- বিভিন্ন ধরনের ট্রেজারি বিল ইস্যু করা হয়, যেমন: ৩০ দিন, ৯০ দিন এবং ১ বছর মেয়াদি ইত্যাদি। এ ট্রেজারি বিলগুলো পরবর্তীকালে নতুন প্রবর্তিত ২৮ দিন, ৯১ দিন, ১৮২ দিন, ৩৬৪ দিন, ২ বছর এবং ৫ বছর মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিল।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি ট্রেজারি বিলের প্রধান সংরক্ষণকারী হিসেবে কাজ করে। বিলগুলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিলামে বিক্রয় হয়।

২. বাণিজ্যিক কাগজ: স্বল্পমেয়াদি জামানতবিহনি অঙ্গীকার পত্রকে বাণিজ্যিক কাগজ বলে। বড় বড় নামকরা প্রতিষ্ঠান এগুলো
মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নে প্রয়োজন মিটায়। এর মেয়াদ সাধারনত ৩ মাস থেকে ১ বছর হয়ে থাকে। এটি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য বিক্রয় করা হয়। এই নির্ধারিত মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যর পার্থক্য হলো বাণিজ্যিক কাগজ ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সুদ বা মুনাফা। এটি সরাসরি অথবা ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এর ক্রেতা হলো বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩. ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র: বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কোন মেয়াদি ড্রাফট প্রস্তুত করে এর বাহককে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে তখন তাকে ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র বলে। অভ্যন্তরীণ অথবা আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যেও ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র প্রস্তুত হয়। এটি যখন কোন ব্যাংক কর্তক অনুমোদিত হয় তখন একে ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর মেয়াদ ৩০ থেকে ১৮০ দিন হয়ে থাকে। যে সকল কোম্পানির ঋণ পরিশোধের সুনাম ও ক্ষমতা রয়েছে ব্যাংক তাদেরকেই এ ধরনের অর্থায়নের সুবিধা প্রদান করে থাকে। এটি দু'টি কোম্পানির মধ্যে বিক্রয়যোগ্য দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পণ্য বিক্রেতা এর মেয়াদান্তে অথবা মেয়াদ পুর্তির পূর্বে কম দামে বিক্রি করে নগদ অর্থের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

৪. পুণঃক্রয় চুক্তি: পুণঃক্রয় চুক্তি হলো একটা স্বল্প মেয়াদি সিকিউরিটি যা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে শর্তসাপেক্ষে মূল বিক্রেতা পূর্বনির্ধারিত মূল্যে সিকিউরিটি পুণ:রায় ক্রয় করে নিবে। এর নির্ধারিত মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য হলো এটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সুদ বা মুনাফা। এ সুদের হারকে রিপোরেট বলা হয়। যদি পুণ:ক্রয় চুক্তি একদিন অথবা খুব কম সময়ের জন্য হয় তখন তাকে ওভার রিপো বলা হয়। আবার যদি এ চুক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্য হয় তখণ তাকে টার্ম রিপো বলা হয়।

৫. হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নির্দিষ্ট সুদের হারে আমানতের বিপরীতে যে স্বল্পমেয়াদি সার্টিফিকেট বাজারে ছাড়ে তাকে হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট বলে। মেয়দি পূর্তির পূর্বে নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে এটি মুদ্রা বাজারে বিক্রি করা যায় তাই এটিকে হস্তান্তরওযাগ্য দলিল বলে। আমানত গ্রহীতা এই রসিদের মাধ্যমে তার বাহককে আমানতকৃত অর্থ মেয়াদান্তে সুদ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। এটিতে অর্থ পরিশোধের তারিখ ও পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করা থাকে। এটি ট্রেজারি বিল হতে অধিক আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং এটি ট্রেজারি বিল ও বাণিজ্যিক কাগজ চেয়ে তুলনামূলকভাবে সহজ শর্তে ও অধিক নমনীয় মেয়াদে মুদ্রাবাজারে বিক্রয় করা যায়।

পুঁজি বা মূলধন বাজার (Capital Markets)

পুঁজি বা মুলধন বাজার বলতে ঐ বাজারকে বুঝায় যেখানে দীর্ঘমেয়াদী (১ বছরের অধিক সময়) আর্থিক সম্পদ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। সুতরাং যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের অধিক মেয়াদ সম্পন্ন আর্থিক সম্পদ লেনদেন হয় তাকে পুঁজি বা মুলধন বাজর বলা হয়। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুঁজি বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। মূলধন বাজারে দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি সমূহ লেনদেন হয়, যেমন: বন্ড, স্টক ও মর্টগেজ ইত্যাদি।

পুঁজি বাজারের হাতিয়ার/ উপাদানসমূহ

যে সকল আর্থিক সম্পদ পুঁজি বাজারে ক্রয়- বিক্রয় হয় সে গুলোকে পুঁজি বাজারের হাতিয়ার বা উপাদান বলে। যেমন: শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার এবং বন্ড ইত্যাদি। নিম্নে পুঁজি বাজারের এসব উপাদান বা হাতিয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **সাধারণ শেয়ার:** পুঁজি বাজারের প্রধান উপাদান হলো সাধারণ শেয়ার। শেয়ার হলো একটি দলিল যা কোম্পানির আংশিক মালিকানা উপস্থাপন করে। সাধারনত যৌথমূলধনী কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের সাহায্যে মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ার ক্রয়ের সাহায্যে প্রতিটি শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির আংশিক মালিকানা লাভ করে। শেয়ারমালিকগণ পরিচালক নির্বাচনে ভোট দিতে পারে ও শেয়ারহোল্ডারদের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করতে পাওে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত দিতে পারে। এধরনের শেয়ারহোল্ডারগণ মুনাফার একটি অংশ লভ্যাংশ হিসেবে পেয়ে থাকে।

২. **অগ্রাধিকার শেয়ার:** এটি বিক্রয় করে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করা হয়। যে সকল শেয়ার মালিকগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তি ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারন শেয়ারমালিকগনের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার বলা হয়। এধরনের শেয়ারমালিকগণ এর কোন ভোটাধিকার থাকে না এবং কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত দিতে পারে না। এটির কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে না এবং এর লভ্যাংশের হার পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট থাকে।

৩. **বন্ড বা ঋণপত্র:** বন্ড হলো একটি দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের দলিল যা ইস্যুকারি প্রতিষ্ঠানকে এর ধারককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। এটিতে ফেস ভেলু, সুদের হার, ঋণের পরিমাণ এবং মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা থাকে। এটি ইস্যু করার সাহায্যে একটি কোম্পানি দীর্ঘ মেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। এর হোল্ডারগণ নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	আর্থিক বাজারের ধারণা, অর্থ বাজার ও পুঁজি বাজার পর্যবেক্ষণ কওে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ :

আর্থিক বাজার হচ্ছে হলো এমন একটি বাজার যেখানে আর্থিক সম্পদ সমূহ ক্রয় বিক্রয় হয়। আর্থিক সম্পদ সমূহ হলো: শেয়ার, বন্ড ও বাণিজ্যিক পত্র ইত্যাদি। আর্থিক বাজারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: ১. অর্থ বাজার **(Money Market):** যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের কম মেয়াদ সম্পন্ন আর্থিক সম্পদ সমূহ লেনদেন হয় তাকে অর্থ বাজার বলে। অর্থ বাজারের উপাদান সমূহ হলো: ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজ, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, পুণঃক্রয় চুক্তি, হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট ইত্যাদি। ২. পুঁজি বাজার **(Capital Market):** যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের অধিক মেয়াদ সম্পন্ন আর্থিক সম্পদ লেনদেন হয় তাকে পুঁজি বা মুলধন বাজর বলা হয়। মূলধন বাজারে দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি সমূহ লেনদেন হয়, যেমন: বন্ড, স্টক ও মর্টগেজ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাওঃ

১. যে বাজারে আর্থিক সম্পদ সমূহ ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে কী বলে?

ক. আর্থিক বাজার খ. অর্থ বাজার
গ. পুঁজি বাজার ঘ. মাধ্যমিক বাজার

২. যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের কম মেয়াদ সম্পন্ন আর্থিক সম্পদ সমূহ লেনদেন হয় তাকে কী বলে?

ক. আর্থিক বাজার খ. অর্থ বাজার
গ. পুঁজি বাজার ঘ. মাধ্যমিক বাজার

৩. নিচের কোনটি অর্থ বাজারের উপাদান?

ক. ট্রেজারি বিল খ. ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র
গ. বাণিজ্যিক কাগজ ঘ. সবগুলো

৪. যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ এক বছরের অধিক মেয়াদ সম্পন্ন আর্থিক সম্পদ লেনদেন হয় তাকে কী বলে?

ক. আর্থিক বাজার খ. অর্থ বাজার
গ. পুঁজি বাজার ঘ. মাধ্যমিক বাজার

৫. নিচের কোনটি পুঁজি বাজারের হাতিয়ার?

ক. সাধারণ শেয়ার খ. অগ্রাধিকার শেয়ার
গ. বন্ড বা ঋণপত্র ঘ. সবগুলো

পাঠ-২.২ শেয়ার বাজারের ধারণা, প্রকারভেদ, স্টক এক্সচেঞ্জ ও এর প্রকারভেদ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজারের মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শেয়ার বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শেয়ার বাজারের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শেয়ার বাজার (Share Market)

যে বাজারে কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে শেয়ার বাজার বলে। এটি কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীদের শেয়ার লেনদেনের সুষ্ঠুভাবে জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এধরনের প্রতিষ্ঠানকে স্টক একচেঞ্জ বলে। বাংলাদেশের দু'টি শেয়ার বাজার রয়েছে, যেমন: (১) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও (২) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। শেয়ার বাজারকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়: ১. প্রাথমিক বাজার ও ২. মাধ্যমিক বাজার ।

নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১. প্রাথমিক বাজার: যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার প্রথম বার ইস্যু করা হয় তাকে প্রাথমিক বাজার বলে। এক্ষেত্রে শেয়ার বা সিকিউরিটি বিক্রয়ের অর্থ ইস্যুকারী কোম্পানি সরাসরি পেয়ে থাকে। একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানির শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাবে অংশ গ্রহণ করে লটারির মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করার সুযোগ পায়। এ বাজারে একবারই শেয়ার বিক্রি করা হয়। অর্থাৎ এখানে বার বার লেনদেন করা হয় না। সুতরাং কোন কোম্পানি যে বাজারে শেয়ার বিক্রির প্রথম প্রস্তাব (Initial public offer) করে, সে বাজারকে প্রাথমিক বাজার বলে।

২. মাধ্যমিক বাজার: যে বাজারে প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজসমূহ বারংবার ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করা হয় তাকে মাধ্যমিক বাজার বলে। এটির সাহায্যে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। বাংলাদেশে দু'টি মাধ্যমিক শেয়ার বাজার রয়েছে, যেমন: ১) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও ২) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ইত্যাদি। এ বাজারের উদ্দেশ্য হলো সিকিউরিটিজ সমূহের তারল্য বজায় রাখা ও সিকিউরিটিজ সমপর্কে তথ্য সরবরাহ করা। যেমন: শেয়ারের বাজার মূল্য, শেয়ার প্রতি আয়, শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ও প্রাইজ আরনিংস রেশিও ইত্যাদি।

শেয়ার ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান এবং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত শেয়ার বাজার প্রয়োজন। এধরনের প্রতিষ্ঠানকে স্টক এক্সচেঞ্জ বলে। কোম্পানিগুলো স্টক এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে এবং বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। বাংলাদেশে দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে; যেমন:

১) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
২) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

এ দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জে বিভিন্ন কোম্পানির সাধারণ শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং বন্ড ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারগুলোকে এ,বি, জি, এন এবং জেড

ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এ দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জকে গতিশীল করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
নিম্নে এ দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জঃ বাংলাদেশর সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ মাধ্যমিক শেয়ারবাজার হলো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ । ১৯১৩ সালের কোম্পানির আইনের আওতায় এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৫৪ সালে নিবন্ধিত হয়ে East Pakistan Stock **Ex**change Association Ltd. নামে ১৯৫৬ সালে যাত্রা শুরু করে। ১৯৬২ সালে এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "East Pakistan Stock Exhange Ltd." এবং ১৯৬৪ সালে তা পুনরায় পরিবর্তিন করে বর্তমান ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নাম করন করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৭১ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১৯৬টি যার পরিশোধিত মুলধনের পরিমাণ ছিল ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্চ এর কোম্পানির সংখ্যা হলো ৫৬৪ টি । এটি ১৮ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমেই শুধুমাত্র এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া যায় এবং লেনদেনে অংশগ্রহণ করা যায়। সাধারণত শেয়ারবাজারের গতি বা সার্বিক অবস্থা বুঝার জন্য সূচক ব্যবহার করা হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তিনটি সূচক ব্যবহার হয়। যেমন:

ক. ডিএসই ব্রড সূচক
খ. ডিএসইএস সূচক এবং
গ. ডিএসই ৩০ সূচক

২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জঃ দেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হলো সিএসই। ১৬৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর হতে এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা এক্সচেঞ্জের ন্যায় কোম্পানি আইনের আওতায় অলাভজনক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত হয়ে (নিবন্ধক তারিখ: ১.৪.১৯৯৫) ট্রেডিং শুরু করে। শুরুতে এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি এবং পরিশোধিত শেয়ার মুলধন ও ডিবেঞ্চারসহ এর মোট মুলধনের পরিমাণ ছিল ২১৫.৪ কোটি টাকা। এটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো ১৮ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এর উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্যাবলি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের অনুরূপ। ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা ছিল ২৮৯ এবং বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৫৭১৪৬.৪০ কোটি টাকা। বর্তমানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর কোম্পানির সংখ্যা হলো ২৯৬ টি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো এটিতেও তিনটি সূচক ব্যবহার হয়। যেমন:

ক. সিএসই সকল শেয়ারমূল্য সূচক
খ. সিএসইএক্স সূচক
গ. সিএসই ৩০ সূচক

প্রাথমিক বাজার ও সেকেন্ডারি বাজারের মধ্যে পার্থক্যঃ

শেয়ার বাজারে দু'ভাবে বিনিয়োগ করা যায়; যেমন: প্রাথমিক বাজার ও সেকেন্ডারি বাজার। নিম্নে প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি বাজারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

প্রাথমিক বাজার	মাধ্যমিক বাজার
যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার প্রথম বার ইস্যু করা হয় তাকে প্রাথমিক বাজার বলে।	যে বাজারে প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ সমূহ বারংবার ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করা হয় তাকে মাধ্যমিক বাজার বলে।
এ বাজারের মাধ্যমে নতুন শেয়ার ইস্যু করার মূল উদ্দেশ্য হলো অধিক মুলধন সংগ্রহ করা।	এ বাজারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তারল্য বজায় রাখা এবং সিকিউরিটিজ সম্পর্কে যেমন: বর্তমান বাজার মুল্য, ইপিএস ও লভ্যাংশ ইত্যাদি তথ্য প্রদান করা।
এ বাজারে শেয়ার ইস্যু করার পূর্বে এর মূল্য করা হয়।	এ বাজারে শেয়ারের মূল্য প্রতি মুহূর্তে উঠানামা করে।
এ বাজারে বিনিয়োগের তুলনামুলকভাবে ঝুঁকি কম।	এ বাজারে শেয়ার মূল্য সর্বদা উঠানামা করার কারণে

	বিনিয়োগ তুলনামুলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।
এ বাজারে অন্যতম বিনিয়োগকারী হলো: ব্যাক্তি, সরকারি ও সেরকারি প্রতিষ্ঠান, মার্চেন্ট ও বিনিয়োগ ব্যাংক ইত্যাদি।	এ বাজারে অন্যতম বিনিয়োগকারী হলো: ব্যাক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ব্রোকার, ডিলার ও সিকিউরিটিজ ফার্ম ইত্যাদি।
এ বাজারে জালিয়াতির সুযোগ নেই বললেই চলে।	এ বাজারে জালিয়াতির সুযোগ অনেক বেশি।
এ বাজারে শেয়ারের মূল্য সুচক ব্যবহার করা হয় না।	এ বাজারে শেয়ারের মূল্য সুচক নির্ণয় ও ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শেয়ার বাজার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাজার এবং স্টক এক্সচেঞ্জ পর্যবেক্ষণ করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ :

যে বাজারে কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে শেয়ার বাজার বলে। শেয়ার বাজারকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়: ১. প্রাথমিক বাজার: যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার প্রথম বার ইস্যু করা হয় তাকে প্রাথমিক বাজার বলে, ২. মাধ্যমিক বাজার: যে বাজারে প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ সমূহ বারংবার ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করা হয় তাকে মাধ্যমিক বাজার বলে। বাংলাদেশে দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে; যেমন: ১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার ও বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে কী বলে?

ক. আর্থিক বাজার খ. অর্থ বাজার
গ. শেয়ার বাজার ঘ. মাধ্যমিক বাজার

২. যে বাজারে কোন কোম্পানির শেয়ার প্রথম বার ইস্যু করা হয় তাকে কী বলে?

ক. প্রাথমিক বাজার খ. অর্থ বাজার
গ. পুঁজি বাজার ঘ. মাধ্যমিক বাজার

৩. যে বাজারে প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ সমূহ বারংবার ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করা হয় তাকে কঅ বলে? মাধ্যমিক বাজার বলে।

ক. প্রাথমিক বাজার খ. অর্থ বাজার
গ. পুঁজি বাজার ঘ. মাধ্যমিক বাজার

৪. বাংলাদেশে কয়টি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে?

ক. ২টি খ. ১টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

পাঠ-২.৩ আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ, আইনসমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা (Regulatory Authority of Financial Markets, Brief Concepts of Laws)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের এ সংক্রান্ত ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- আর্থিক বাজার সংশ্লিষ্ট আইন সমূহের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।

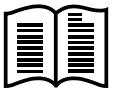

আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ

যে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ আর্থিক বাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলে। বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহ হলো:

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক
খ. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
গ. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তপক্ষ

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank): বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করে থাকে। এটি মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের কার্যালি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং প্রয়োজনে ঋণ সরবরাহ করে থাকে। এজন্য এটিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের ব্যাংক ও ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থলও বলা হয়। নিম্নে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান প্রধান কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের জন্য প্রয়োজনে কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রা তৈরি, মুদ্রণ ও সরবরাহ করা। দেশের জনগণের চাহিদা, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

২. মুদ্রার মূল্যমান সংরক্ষণ: বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার মূল্যমান সংরক্ষণ করে। ফলে দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

৩. স্বর্ণমান সংরক্ষণ : প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরবরাহকৃত বা ছাপানো অর্থের নিরাপত্তা বিধান ও বিনিময় হার রক্ষার জন্য এর বিপরীতে ৩০% স্বর্ণ বা রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখে।

৪. মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের জন্য একটি সুষ্ঠু অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী মুদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. ঋণ নিয়ন্ত্রণ: দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণের প্রয়োজন। আবার ঋণের পরিমাণ বেশি হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ সৃষ্টির কার্যক্রম ও ক্ষমতা বিভিন্ন কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার মান ও বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনের আলোকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে সংরক্ষিত তহবিলের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. সরকারের তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে সরকারের যাবতীয় উদ্বৃত্ত তহবিল এবং সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করে।

৮. সরকারের হিসাব সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা করে।

৯. বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে দেশীয় অর্থনীতি উন্নয়ন, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় এবং বৈদেশিক বিনিময় দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে।

১০. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ, চুক্তিসম্পাদন ও লেনদেন সম্পাদন করে থাকে। অপর দিকে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারকে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে।

১১. সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নে সকল প্রকার তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে। অপর দিকে ইহার সুষ্ঠু বাস্তবায়নেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

১২. ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোর শাখা বিস্তার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৩. ব্যাংক তালিকাভুক্তিকরণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতির সাথে সাথে ইহার নাম তালিকাভুক্তি করা। এজন্য তালিকাভুক্তির পূর্বে এবং পরে পালনীয় কতিপয় শর্তাবলী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় এবং তা সঠিকরূপে পালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে।

১৪. তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর অভিভাবক, মুরব্বি এবং পরিচালক। তালিকাভুক্ত সকল সদস্য ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রদত্ত নীতিমালা, নির্দেশাবলীর আলোকে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

১৫. ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে স্বাভাবিক সময়ে ঋণদানের সাথে সাথে চরম আর্থিক সংকটেও ঋণদান করে থাকে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যখন বিকল্প কোন উৎস থেকেই ঋণ পায় না তখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দিয়ে সাহায্য করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

১৬. ঋণ তদারক: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস থেকে গৃহীত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিরূপে ঋণমঞ্জুর করছে এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে সহায়ক হবে কিনা ইত্যাদি তদারকী কার্যক্রমও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

১৭. নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ: তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন ও দেনা-পাওনার নিস্পত্তির ব্যাপারে নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে থাকে। সারা বিশ্বেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেনা-পাওনা নিস্পত্তিতে নিকাশ ঘর পরিচালনা করে থাকে।

১৮. ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক এবং ব্যাংকিং খাতের নেতা, পথ প্রদর্শক। তাই দেশে নতুন নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, শাখা খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতের বাস্তব উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল প্রকার নীতিমালা তৈরি করে।

১৯. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উন্নয়ন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকে।

২০. গবেষণা পরিচালনা: দেশের অর্থ ও মূদ্রা বাজার উন্নয়ন, ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারের আর্থিক নীতিমালা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রয়োজনের আলোকে বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পৃথক শাখা রয়েছে।

(খ) সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (Securities and Exchange Commision): এটি বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯৩ সালের সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইনের আওতায় গঠিত হয়। এটি ১৯৪৭ সালের মূলধন ইস্যু আইনের আওতায় মূলধন ও শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে আসছে। এটি পাচঁ সদস্য বিশিষ্ট্য কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য। এরা সবাই সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত। কোন কোম্পানি বাজারে নতুনভাবে শেয়ার ছাড়তে হলে এটির অনুমোদন নিতে হয়। এটির তালিকাভূক্ত প্রতিটি কোম্পানি বা ব্যাক্তি যারা জালিয়াতি ও সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ও জড়িমানা করে থাকে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নামে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে।
নিম্নে এটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. স্টক এক্সচেঞ্জ এর কার্যালি নিয়ন্ত্রণ: এটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর যাবতীয় কার্যালি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি দু'টি স্টক এক্সচেঞ্জকে মনিটর করে এবং যে কোন জালিয়াতি বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২. ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ: এটি শেয়ার বাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাবতীয় কার্যালি নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারনত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে লেনদেন করে এবং এক্ষেত্রে ব্রোকারেজ হাউজ যদি কোন জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকে তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একটি কোম্পানি যে উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকে এবং কোম্পানি যতি অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ব্যয় করে তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৩. লেনদেন নিয়ন্ত্রণ: কমিশন বিধি বহির্ভূতভাবে যদি কোন একটি কোম্পানি অন্য কোন কোম্পানির সকল বা অধিকাংশ শেয়ার কিনে নেয় তাহলে এটি এধরনের অনিয়মকে প্রতিহত করে। তাছাড়া এটি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলে। ফলে বিনিয়োগকারীরা বড় ধরনের ক্ষতি হতে রক্ষা পায়।

(গ) বিমা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ (Insurance Development and Regulatory Authority): একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিমা কোম্পানির ভূমিকা অনেক। এটি মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলদেশের বিমা কোম্পানিগুলোর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য গঠিত হয়েছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ। বিমা কোম্পানি বিমা গ্রহীতার নিকট হতে প্রিমিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। বিমা কোম্পানি উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ২০১০ সালে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য।

আইন সমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, আকার, প্রকৃতি, আইনগত ভিত্তি, ব্যস্থাপনার ভিন্নতার কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরণ ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন: এক মালিকানা ব্যবসায়, অংশিদারি ব্যবসায় ও যৌথমূলধনী ব্যবসায় ইত্যাদি। এসকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন ধরনের আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য আইন সমূহ হলো:

১. অংশীদারি আইন ১৯৩২
২. কোম্পানি আইন ১৯৯৪
৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১
৪. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২
৫. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭
৬. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯
৭. বিমা আইন ২০১০

নিম্নে এ সকল আইন সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. অংশীদারি আইন ১৯৩২

সাধারনত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হলে লিখিত বা মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে অংশীদার ব্যবসায় বলে। বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের অংশিদারি আইন অনুযায়ী অংশিদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হয়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের উন্নতির সাথে সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অংশীদারি আইনের উদ্ভব ঘটে। ১৮৯০ সালে সর্বপ্রথম বৃটেনে আদালাভাবে স্বতন্ত্র অংশীদারি আইন পাস হয়। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের আওতায় অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ফলে আলাদা অংশীদারি আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে ১৯৩২ সালের অংশিদারি আইন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পুরাতন আইন বহাল অধ্যাদেশ পাস হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে কার্যকর হয়।

১৯৩২ সালের অংশিদারী আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে চুক্তির ভিত্তিতে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে অংশিদারিত্ব বলে। যারা এরুপ অংশীদারির সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়। চুক্তিই অংশীদারী ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি।
অংশীদারি আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারির সম্পর্ক চুক্তি হতে জন্ম লাভ করে; জন্মগত বা সামাজিক অধিকার বলে নয়।
চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ ব্যবসায়ের মূলধন সংস্থান করেন এবং লাভ বা ক্ষতি বন্টন করে থাকে। এধরনের ব্যবাসায়ে অংশীদারগণের দায় অসীম। ব্যবসায়ের জন্য সুবিধাজনক হলে মূলধন সংস্থানের জন্য সীমিত অংশীদারও নেয়া হয়ে থাকে।

২. কোম্পানি আইন ১৯৯৪

যে সকল কোম্পানির মূলধন অনেক বেশি যেমন: কেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যারস, স্কয়ার কোম্পানি ও বাটা সু কোম্পানি ইত্যাদি হলো যৌথমুলধনী কোম্পানি। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথমূলধনী কোম্পানি গঠিত ও পরিচালত হয়ে থাকে । ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন পাস হওয়ার পূর্বে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথমূলধনী কোম্পানি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২ (১ঘ) ধারা অনুযায়ী, কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোন বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝায়। নিবন্ধিত কোম্পানি সাধারণত নিম্নোক্ত দু'ধরনের হয়:

ক) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও
খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

এটির ব্যবস্থাপনা মালিকনা হতে পৃথক হয়ে থাকে। শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। এটির মূলধন নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে বিভক্ত করা হয়। অথাৎ মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে শেয়ার বলে। শেয়ারহোল্ডারগণই হলো কোম্পানির প্রকৃত মালিক। শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যু বা দেওলিয়া হলেও এটি বিলুপ্ত হয় না। তাই এটিকে চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলে। এটি আলাদা সিলমোহর তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে ও দলিলে ব্যবহার করে। কোম্পানি গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি দলিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

ক. স্মারকলিপি: এটি কোম্পানির মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান যাতে কোম্পানির উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি ও ক্ষমতা উল্লেখ করা থাকে এবং এটি দ্বারা কোম্পানির সাথে শেয়ারহোল্ডার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে। স্মারকলিপিতে যে সকল বিষয় গুলো উল্লেখ থাকে তা হলো: কোম্পানির নাম, অবস্থান ও ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার, দায়-দায়িত্ব ও সম্মতি ইত্যাদি।

খ. পরিমেল নিয়ামবলি: এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল যার মধ্যে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মবলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এটিতে যে সকল বিষয় অর্ন্তভূক্ত থাকে তা হলো দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা, পরিচালক সংক্রান্ত নিয়মাবলি ও কোম্পানির বিলোপসাধন সংক্রান্ত নিয়ম ইত্যাদি।

৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১

ব্যাংক সাধারনত আমানতকারীর নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে এবং এ অর্থ দিয়ে ব্যাংক ব্যবসায় করে থাকে। এটি গ্রাহকদের অর্থে পরিচালিত হয়। তাই এ ধরনের ব্যবসায়ের পূর্বশর্ত হলো আমানতকারীদের আস্থা অর্জন। এ কারণেই গ্রাহক তাদের অর্থ ও মুল্যবান সম্পদ (লকার সেবা) ব্যাংকের নিকট জমা রাখে। তাই এ প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা ও বিধি বিধান থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

এই আইন ১৯৯১ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি তারিখ হতে কার্যকর করা হয়। এটি কার্যকর হওয়ার পূর্বে ব্যাংকিং কোম্পানি অধ্যাদেশ ১৯৬২ অনুসারে এ ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো।

বাংলাদেশের ব্যাংক কোম্পানির কার্যাবলি ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। নিম্নে এ কোম্পানির কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক. ব্যাংক কোম্পানির কার্যাবলি

১. আমানতের অর্থ গ্রহণ ও ঋণ প্রদান;

২. অগ্রিম অর্থ বা ঋণ প্রদান;

৩. বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতিপত্র, কুপন., ড্রাফট, বহনপত্র, রেলওয়ে রশিদ, ওয়ারেন্ট, ঋণপত্র, সার্টিফিকেট, মেয়াদি অংশগ্রহণপত্র, মেয়াদি অর্থ সংস্থাপনপত্র, মুশারিকা সার্টিফিকেট, মুদারাবা সাটিফিকেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অনুরুপ অন্যান্য দলিল, এবং হস্তান্তর বা বিনিময়যোগ্য হোক বা না হোক এমন অন্যান্য দলিল সম্পাদন ও লিখন, দাবী প্রস্তুতকরণ;

৪. লেটার অব ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, ক্রেডিট কার্ড এবং সার্কুলার নোট অনুমোদন ও ইস্যু করা;

৫. স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রা লেনদেন;

৬. বৈদেশিক ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ক্রয়-বিক্রকয় করণ ;

৭. স্টক, তহবিল, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, স্টক, বন্ড, দায় সম্পত্তি নিদর্শনপত্র, মেয়াদি অংশগ্রহণপত্র, মেয়াদি অর্থ সংস্থান পত্র ক্রয় ও বিক্রয়;

৮. গচ্ছিত সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য ভল্টের ব্যবস্থা করণ;

৯. এটির কোন দাবীর আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য কোন সম্পত্তি জামানত হিসেবে গ্রহণ বা সম্পত্তির উদ্ধার ও ব্যবস্থাপনা;

১০. কোন ঋণ অথবা অগ্রিমের বিপরীতে জামানতকৃত সম্পত্তির অধিকার, স্বত্ব অর্জন, ধারণ ও তাদের ব্যবস্থাপনা;

১১. ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১২. এর কর্মচারী, প্রাক্তন কর্মচারী বা তাদের পোষ্যগণের কল্যাণার্থে-

ক) সমিতি, তহবিল ট্রাস্ট অথবা অন্য কোন সংস্থা স্থাপনকল্পে সাহায্য বা সহযোগিতা করা;

খ) পেনশন ও ভাতা প্রদান;

গ) বিমার প্রিমিয়াম প্রদান;

ঘ) প্রদর্শনী বা অন্য কোন কাজে চাঁদা প্রদান;

খ) নূন্যতম আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল: বাংলাদেশের সকল ব্যাংককে নূন্যতম ৪০০ কোটি টাকা আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন (১০%) এর সমান টাকা; উভয়ের মধ্যে যেটি বেশি হয়, তার কম হবে না।

গ) ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ে বিধি-নিষেধঃ কোন ব্যক্তি, কোম্পানি বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যাংকের শেয়ার কেন্দ্রীভুত করা যাবে না এবং কোন ব্যক্তি, কোম্পানি বা কোন পরিবারের সদস্যগণ একক, যৌথ বা উভয়ভাবে কোন ব্যাংকের শতকরা দশ ভাগের বেশি শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন না ।

ঘ) সংরক্ষিথ নগদ তহবিলঃ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংক কোম্পানি গুলোকে সংরক্ষিত নগদ তহবিল সিআরআর হিসাবে তাদের মেয়াদী ও চাহিবামাত্র দায় এর ৬.৫% (বর্তমান প্রচলিত) এর সমপরিমান নগদ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

৪. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২

মানি লন্ডারিং বলতে অবৈধভাবে সম্পদ ও অর্থ উপার্জন এবং অবৈধভাবে এর স্থানান্তরকে বুঝায়। বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে সরাসরি অর্থ স্থান্নাতর করার অনুমতি নাই। তাই যারা অবৈধভাবে অর্থ বা সম্পদ উপার্জন করে তা স্থানান্তর বা লুকানোর জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সামাজিক অবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এবং এধরনের অপরাধ দমন করার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২০০২ সালের এপ্রিলের ৫ তারিখে মানি লন্ডারিং আইন ২০০২ অনুমোদনপ্রদান করেন এবং ২০০৩ সালের ১লা মে থেকে এটি কার্যকর হয়। এ আইন অনুযায়ী মানি লন্ডারিং অপরাধের শাস্তি হলো ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদন্ড এবং মানি লন্ডারিং অপরাধের সাথে জড়িত অর্থের দ্বিগুণ অর্থদন্ড।

৫. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭

এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় রুপ্তান্তরিত করাকে বৈদেশিক বিনিময় বলা হয়। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে সৃষ্ট দায়-দেনা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। কারণ এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে লেনদেনেরে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার যে সকল আইন ও কার্যক্রম প্রণয়ন করে সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

এক সময় পাক ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশ সরকার শাসন করতো। ব্রিটিশ সরকার কিছু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জাতীয় পার্লামেন্টে এ আইন পাস করে এবং এটি পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ আইন বহাল রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদিত ব্যবসায়ীঃ

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত একক প্রতিষ্ঠান এবং এটি মুদ্রা ব্যবসায়ের অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একক প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করে কেবল সে সকল প্রতিষ্ঠানই হলো বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদিত ব্যবসায়ী। এদেশে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদিত ব্যবসায়ী বা ডিলার হিসেবে কাজ কওে এবং এরা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে থাকে। লাইসেন্স এর ধরন অনুযায়ী অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ী দু'ধরনের তা হলো:

ক. সব ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় এব্ং বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিময় কার্যক্রমের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী বা ডিলার।

খ. সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জন্য এবং নির্দিষ্ট বিনিময়ের জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবসায়ী বা ডিলার।

৬. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে শেয়ারবাজার মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। তাই শেয়ার বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। সে জন্য শেয়ার বাজারের উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা, স্বার্থ

সংরক্ষণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সিকিউরিটিজ কীভাবে ইস্যু করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য ১৯৬৯ সালের ২৫ শে মার্চ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯ জারি করা হয় এবং উক্ত বছরের ২৮ জুন হতে এটি কার্যকর করা হয়।

স্টক এক্সচেঞ্জ এর সাহায্যে শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীদের শেয়ার-ক্রয় বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এটি জনগণ বা প্রতিষ্ঠান থেকে কোম্পানিকে তহবিল সংগ্রহে সাহায্য ও সহযোগিতা করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য শেয়ার ক্রয়- বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশে দু'টি স্টক এক্সচেঞ্চ রয়েছে ১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও ২. চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। স্টক এক্সচেঞ্জে দালালের সাহায্যে সিকিউরিটিজ লেনদেন করা হয়। দালাল বলতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যে অন্য কারো পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকে।

৭. বিমা আইন ২০১০

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলা হয়। বিমা পলিসির সাহায্যে ঝুঁকি পরিহার করা যায়। তাছাড়া এটি মূলধন গঠনে সাহায্য কওে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিমা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিমা পলিসির সাহায্য নির্দিষ্ট কোন ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি বিমা গ্রহীতাদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং বিনিময়ে বিমা গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রিমিয়াম হিসেবে প্রদান করতে হয়। ২০১০ সালের বিমা আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ বিমা ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর পূর্বে বাংলাদেশে ১৯৩৮ সালের বিমা আইন অনুযায়ী বিমা ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

২০১০ সালের বিমা আইনের ৫ (১) ধারায় বিমাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা: ১. জীবন বিমা ও ২. সাধারণ বিমা।

১. জীবন বিমা: জীবন বিমার বিষয়বস্তু হলো মানব জীবন। যে বিমা চুক্তির প্রধান উপাদান হলো মানব জীবন তাকে জীবন বিমা বলে। এ ধরনের বিমা চুক্তিতে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার মৃত্যু, বিভিন্ন ধরনের রোগ, দূর্ঘনার কারণে যদি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে বিমা চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতি পূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়।

২. সাধারণ বিমা: সাধারণ বিমা বলতে অগ্নি বিমা ও নৌ-বিমাকে বুঝায়। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক. নৌ-বিমা: এটি এমন একটি চুক্তি যার সাহায্যে বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সমুদ্র পথে নৌ-যান ও জাহাজ বাহিত পণ্যসামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হয়। ১৯৩৮ সালের বিমা আইনের ২(১৩.ক) ধারায় বলা হয়েছে। জাহাজ, পণ্য, জাহাজ ভাড়া বা মাসুল এবং আইনসঙ্গতভাবে বিমার উপযুক্ত অন্যান্য স্বার্থসহ যে কোন ধরনের জাহাজ সংক্রান্ত বিমা চুক্তিই নৌ-বিমা চুক্তি বলে বিবেচিত হবে।

খ. অগ্নি বিমা: এটি এমন এক ধরনের চুক্তি যার সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে অগ্নিকান্ডের ফলে আর্থিক ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদান করার অঙ্গীকার করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা; যথা: ক. বাংলাদেশ ব্যাংক, খ. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও গ. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তপক্ষ পর্যবেক্ষণ কর এবং এসব প্রতিষ্ঠান যে সকল আইন অনুসারে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় পর্যালোচনা করে তুমি তোমার শিখন কার্যটি ঝালাই করে নাও।

সারসংক্ষেপ

যে সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ আর্থিক বাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলে। বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহ হলো: ক. বাংলাদেশ ব্যাংক, খ. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও গ. বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তপক্ষ। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরণ ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন: এক মালিকানা ব্যবসায়, অংশিদারি ব্যবসায় ও যৌথমূলধনী ব্যবসায় ইত্যাদি। এসকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন ধরনের আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য আইন সমূহ হলো: ১. অংশীদারি আইন ১৯৩২, ২. কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, ৪. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন

২০০২, ৫. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭, ৬. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯ও ৭. বিমা আইন ২০১০।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দাও:

১. যে সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিক বাজারের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে তাদের কে কী বলে?

ক. নিয়ন্ত্রক সংস্থা খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ঘ. মাধ্যমিক বাজার

২. নিচের কোনটি মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে?

ক. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ঘ. সোনলী ব্যাংক

৩. বাংলাদেশে কত সালের অংশিদারি আইন অনুযায়ী অংশিদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হয়?

ক. ১৯৩০ খ. ১৯৪২
গ. ১৯৩২ ঘ. ১৯৪০

৪. বাংলাদেশে কত সালের বিমা কোম্পানি আইন অনুযায়ী বিমা ব্যবসায় পরিচালিত হয়?

ক. ২০১১ খ. ২০১২
গ. ২০১৩ ঘ. ২০১০

৫. জীবন বিমার প্রধান বিষয়বস্তু কী?

ক. সম্পদ খ. জাহাজ
গ. মানব জীবন ঘ. দালানকোঠা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. আর্থিক বাজার কী?
২. অর্থ বাজার কী?
৩. ট্রেজারি বিল কী?
৪. মুলধন বাজার কী ?
৫. বাণিজ্যিক কাগজ কী?
৬. ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র কী?
৭. সাধারণ শেয়ার কী?
৮. অগ্রাধিকার শেয়ার কী?
৯. বন্ড বা ঋণপত্র কী?
১০. শেয়ার বাজার কী?
১১. প্রাথমিক বাজার কী?
১২. মাধ্যমিক বাজার কী?

খ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক বাজার ও মাধ্যমিক বাজারের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
২. ট্রেজারি বিল কেন ইস্যু করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
৩. কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা? ব্যাখ্যা করুন।
৪. মাধ্যমিক বাজার কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।
৫. মানিলন্ডারিং কেন প্রতিরোধ করা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করুন।
৬. সাধারন বিমা ও জীবন বিমার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)

১. ইসলাম, শামীম ও হাসান তিন বন্ধু। এরা পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সকলে সমান মূলধন সংস্থানের জন্য আরও ১৮ জন সদস্যকে নিতে চাচ্ছেন। এজন্য নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হবে কিন্তু কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোন অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে না।

ক. অর্থ বাজার কী?
খ. পুঁজি বাজারে কোন ধরনের সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. তিন বন্ধু প্রথমে যে ব্যবসায় গড়ে তুলেছেন তা মালিকানার ভিত্তিতে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. নতুন করে অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে গড়তে যাওয়া নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সহায়ক হবে আপনি কী সমর্থন করেন? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

২. দেশের অর্থনীতিতে শেয়ার বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। বাংলাদেশে দু'টি শেয়ার বাজার রয়েছে। এর মধ্যে একটি বড় ও পূরাতন। এ বাজারে প্রতিদিনের লেনদেনের পরিমাণও বেশি এবং এ দু'টি বাজারকে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা রেখে শিল্প ও বাণিজ্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এছাড়াও বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান বিমা প্রতিষ্ঠান গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক, মুদ্রা বাজার কী?
খ. পুঁজি বাজার বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে কোন স্টক এক্সচেঞ্জ এর কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে যে দু'টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করুন।

৩. মিজান ও আযম দুই বন্ধু। এরা যুক্তরাষ্ট থেকে বাংলাদেমে বেশ কিছু টাকা নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আসেন। মিজান তার অর্জিত অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। অন্যদিকে আযম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই তার এলাকায় বসবাসরত প্রবাসীদের আনীত বৈদেশিক মুদ্রাকে বাংলাদেশী টাকায় রুপান্তর করেন। তার এ ধরনের ব্যবসায়ের কারণে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মিজান ও আযম বাংলাদেশী নাগরিক।

ক. বিএসইসি কী?
খ. নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বুঝ?
গ. উদ্দীপকের আলোকে মিজানকে তার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের জন্য কোন আর্থিক বাজারের যেতে হবে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আযমের ব্যবসায় আইনগতভাবে অবৈধ-এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

৪. পদ্মা কোম্পানি লিমিটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করতে গিয়ে সাময়িক আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এ জন্য কোম্পানিটি ব্যাংক হতে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ফরচুন কোম্পানি লিমিটেড তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। যদিও কোম্পানিটির ব্যাংক হতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণের সাহায্যে মূলধন সংগ্রহ করার সুযোগ ছিল।

ক. বন্ড কী?

খ. মানি লন্ডারিং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করে। ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের ফরচুন কোম্পানি লিমিটেড কোন ধরনের আর্থিক বাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করেছেন? তা ব্যাখ্যা করেন?

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফরচুন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক বাজারের ধরণ নির্বাচনের বিশ্লেষণ করুন।

৫. জনাব জারিফ আরো ২০ জন উদ্যেক্তা মিলে ৫০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ইসলাম ক্যাপিটাল লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি অন্য প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে থাকেন। অন্যদিকে, হাসান ট্রেডার্স লিমিটেড এর আর্থিক ব্যবস্থাপক জনাব হাসান শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে লাভবান হতে চান। তিনি বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিয়ত শেয়ার মূল্যের পরিবর্তন বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া তারল্যের বিষয়টিও তিনি বিবেচনা করেন। এজন্য তিনি প্রথমিক বাজার অথবা সেকেন্ডারি বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন।

ক. প্রাথমিক বাজার কী?

খ. মাধ্যমিক বাজার কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব জারিফদের গঠিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দপিকের দু'টি বাজারের মধ্যে জনাব হাসানের কোন বাজারে বিনিয়োগ করা উচিত? যুক্তিসহ উত্তর দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ :	১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. গ